দৈনিক সংবাদ

FEB 8 2001

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ..8.. কলাম ..6..

সরকারি কলেজ শিক্ষায় বিপর্যয়

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অনার্স-মাস্টার্স পড়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত থাকায় ১৯৯২-৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলো, বিশেষত ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সংবলিত সরকারি কলেজগুলোতে অত্যন্ত উদারভাবে অনার্স-মাস্টার্স খোলা হতে থাকে। শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুধাবন করে এবং নিজেদের মান-সম্মান বৃদ্ধির জন্য প্রথমটায় শিক্ষক শ্রেণীও এরূপ কোর্স উন্নয়নে বেশ উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ সরকারি কলেজগুলোতে অনার্স খোলার যে হিড়িক পড়েছে, তার সাথে তাল মিলিয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো তো করাই হয়নি, বরং নানা কারণে শিক্ষার মান অবনতির দিকে যাচ্ছে। এ কারণগুলো উল্লেখ করা এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে করণীয় কাজগুলো বলার জন্যই এ লেখার অবতারণা।

প্রধান কারণগুলো হচ্ছে- ১। প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি না করা, ২। বিদ্যমান পদগুলো খালি পড়ে থাকা, ৩। শিক্ষকদের পদোন্নতি বন্ধ থাকা, ৪। কলেজে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের নিম্নমান (পূর্ব ফাঁকির ফল), ৫। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় পড়াশোনায় কম সময় পাওয়া এবং ৬। আন্তঃপরীক্ষাগুলোর ফেল করানোর ব্যবস্থা না থাকা। এ কারণগুলোর বাইরেও বহু গৌণ কারণ রয়েছে।

মুখ্য কারণগুলোর প্রথমটি হচ্ছে 'প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি না করা'। কলেজগুলোতে শিক্ষকদের একটি সুনির্দিষ্ট পদ-কাঠামো আছে। শুধু উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনা হয় এরূপ বিষয়ে পদ থাকে শুধু সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকের, স্নাতক পাস পর্যায়ের বিষয়ে একটি সহযোগী অধ্যাপক, একটি সহকারী অধ্যাপক এবং দুটি প্রভাষকের পদ (মোট চারজন), মাস্টার্সবিহীন অনার্স বিষয়ে থাকে একটি অধ্যাপক, একটি সহযোগী অধ্যাপক, দুটি সহকারী অধ্যাপক এবং তিনটি প্রভাষকের পদ (মোট ৭ জন) আর অনার্স ও মাস্টার্স উভয় কোর্স সংবলিত বিষয়ে থাকে একটি অধ্যাপক, তিনটি সহযোগী অধ্যাপক, চারটি সহকারী অধ্যাপক এবং চারটি প্রভাষকের পদ (মোট ১২ জন)। বেশ কিছু বড় কলেজের কোন কোন বিষয়ে ১২টির বেশি পদও সৃষ্টি করা হয়েছে।

কিন্তু ইদানীং দেখা যাচ্ছে চারটি পদ নিয়ে অনার্স খোলার পর অনার্স তৃতীয় বর্ষ শুরু হলেও কোন নতুন পদ সৃষ্টি হয় না। ফলে সাতজনের কাজ চারজনকে করতে হয়। এমনকি মাস্টার্স খোলার পরও পদ সৃষ্টি হয় না, তখন ১২ জনের কাজ চারজনকে করতে হয়। এভাবে শিক্ষক স্বল্পতায় কলেজগুলোর শিক্ষা বিঘ্নিত হয়।

দ্বিতীয় কারণ 'বিদ্যমান পদগুলো খালি পড়ে থাকায়' অনেক সময় তিনজন বা দুজন শিক্ষককে ৭ জন বা ১২ জনের কাজ করতে হয়। অনার্স তৃতীয় বর্ষ শুরু হওয়ার পর আমার নিজের বিভাগে দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষক আছি তিনজন। গত বছর প্রধান ক্লাস চলাকালীন (জানুয়ারি থেকে জুন) আমি সপ্তাহে কয়েকদিন অনার্স পর্যায়ের তিনটি এবং পাস/উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের একটি (মোট চারটি) তাত্ত্বিক ক্লাস নিয়ে তিন পিরিয়ড ব্যবহারিক ক্লাস নিয়েছি। এভাবে ক্লাস নিতে হলে ক্লাসের মান কোথায় নামে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বলাবাহুল্য অনার্স-মাস্টার্স পর্যায়ে দিনে দুটির বেশি ক্লাস প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে সঠিকভাবে গ্রহণ করা কোন শিক্ষকের পক্ষেই সম্ভব নয়।

তৃতীয় কারণ অর্থাৎ 'শিক্ষকদের পদোন্নতি বন্ধ থাকা' দ্বিতীয় কারণের একটি 'বড় কারণ'। আর শিক্ষকদের পদোন্নতি বন্ধ থাকার কারণগুলোর মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে নতুন সরকারিকৃত কলেজে শিক্ষকদের আত্তীকরণ বিধির ত্রুটির ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা। আত্তীকরণ বিধিমালা ১৯৮১ ছিল ত্রুটিপূর্ণ। এই বিধি অনুসারে মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ মাত্র ৭ বছর চাকরি হলেই সহকারী অধ্যাপক পদে আত্তীকৃত হতেন। অথচ বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে ১৯-২০ বছরের প্রভাষক রয়েছেন। কিছু আত্তীকৃত প্রভাবশালী শিক্ষকের প্ররোচনায় 'আত্তীকরণ বিধিমালা ১৯৯৮' জারি করা হয়। এটি ছিল আরও এক জঘন্য বিধান। এ বিধানটি বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সঠিক পদক্ষেপের ফলে কার্যকরী করা যায়নি। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত বিধানও তৈরি হয়নি দীর্ঘদিন। তাই হাজার হাজার পদোন্নতিযোগ্য শিক্ষককে পদোন্নতি ছাড়াই চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করতে হয়েছে। ফলে সরকারি কলেজে সৃষ্টি হয়েছে চরম শিক্ষক স্বল্পতা। বর্তমানে ক্যাডারের উপরের স্তরে (সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক) প্রায় তিন হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য পড়ে আছে। এতে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

আশার কথা, গত বছর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর পরামর্শে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি এবং সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের যৌথ আলোচনায় একটা সমঝোতা হয় এবং সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ২৪শে নভেম্বর, ২০০০ "জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা ২০০০" নামে একটি সুচিন্তিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধিমালা জারি করেছে। কিন্তু শিক্ষা ক্যাডারে চাকরির প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকার কারণে সরকার ঘোষিত ১৮টি মহিলা কলেজের বেশকিছু শিক্ষকের আত্তীকৃত হওয়ার সুযোগ না থাকায় তারা নতুন জারিকৃত বিধিমালার বিরোধিতা করে শিক্ষা ক্যাডারের পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করছেন। বেশ কয়েক বছর চাকরি করার পর কলেজ সরকারি হওয়ার কারণে কোন শিক্ষকের চাকরি হারানো অবশ্যই খুব দুঃখজনক। তাই প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবে যাদেরকে শিক্ষা ক্যাডারে আত্তীকরণ করা সম্ভব হচ্ছে না, তাদেরকে নন-ক্যাডার শিক্ষক হিসেবে বেসরকারি অবস্থার ব্যবস্থাটি অর্থাৎ সহকারি অধ্যাপক পর্যন্ত পদোন্নতি প্রাপ্তিকে তাদের মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া জরুরি। 'একই কলেজে দুরকম শিক্ষকের উপস্থিতি অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে' ভাবলে সদাশয় সরকার তাদেরকে পার্শ্ববর্তী কোন এমপিওভুক্ত বেসরকারি কলেজের শূন্য পদে আত্তীকরণের ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু কোন অবস্থায়ই শিক্ষা ক্যাডারের পদোন্নতি প্রক্রিয়াকে আর ঝুলিয়ে রাখা যায় না।

চতুর্থ কারণ অর্থাৎ 'কলেজে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের নিম্নমান (পূর্ব ফাঁকির ফল)' উচ্চ করার কোন সর্ট-কাট প্রক্রিয়া নেই। যথেষ্ট সংখ্যক পদ সৃষ্টি করে উপযুক্ত শিক্ষকদের পদায়ন এবং তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে শিক্ষকগণই শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়নে যথোপযুক্ত সহযোগিতা করতে পারবেন। পঞ্চম কারণ, অর্থাৎ 'শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় পড়াশুনায় কম সময় পাওয়া'র সোজা ওষুধ হচ্ছে তাদেরকে সত্যিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান সময় দিয়ে পরীক্ষা নেয়া। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পরবর্তী ফলাফল তৈরি ও ঘোষণার বিলম্বের দায় শিক্ষার্থীদের ওপর চাপানো চরম অন্যায়। স্বাধীন বাংলাদেশে এরূপ অন্যায় আচরণের অধিকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে কেউ দেয়নি।

ষষ্ঠ কারণ অর্থাৎ 'আন্তঃপরীক্ষাগুলোয় ফেল করানোর ব্যবস্থা না থাকা' তুলে নেয়ার উপায় হচ্ছে কড়াকড়িভাবে এসব পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফেল করা শিক্ষার্থীদের 'ফেল' ঘোষণার শিক্ষক-অধিকার। জানি অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ এ অধিকারটি থাকা সত্ত্বেও আয় কমে যাওয়ার ভয়ে ব্যবহার করেন না। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সত্য হচ্ছে, দীর্ঘদিন রাজনৈতিক কারণে অব্যবহারের ফলে শিক্ষার এই জরুরি অস্ত্রটি ধার হারিয়ে ফেলেছে। একে সামাজিকভাবে আবার ধারালো করে ব্যবহার করতে না পারলে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে কোর্স আলোচনাকালে কম গুরুত্ব দেয় এবং সময় বাজে খরচ করে বিনা প্রস্তুতিতে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করে। আর তখন পাস করার জন্য অসদুপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়।

আশা করি, সদাশয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সবাই আমার পরামর্শগুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। 'গুরুত্বের সাথে' যুক্তি প্রদর্শন করে এগুলো বর্জন করলেও অখুশি হব না।

আবদুস সাত্তার মোল্লা
সরকারি কলেজের প্রভাষক